আজকের কাগজ
তারিখ 09 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১৩

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসঃ সমস্যার উৎসে যেতে হবে

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যখন কোনো কারণে অচল হয়ে পড়ে তখন সমগ্র ঢাকা শহরে তো বটেই, সারা দেশেই তার প্রভাব পড়ে। একটা উদ্বেগের শিকার হয়ে পড়ে সারাদেশ। এ মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি কি, আমার বলার অপেক্ষা রাখে না। ঢাকা শহরের সকল পত্র-পত্রিকায় তার বিশদ বিবরণ বেরিয়েছে। বর্তমান সঙ্কটের মূল কারণ আবাসিক হলগুলোর মধ্যে দলীয় দখলদারিত্বের হাত বদল। বিএনপি'র শাসনামলে যে হলগুলো ছাত্রদলের দখলে ছিলো, তার মধ্যে কয়েকটি এর মধ্যে আওয়ামী লীগ শাসনামলে ছাত্রলীগের দখলে চলে যাওয়ায় দু'দলের ক্ষমতার লড়াই চলছে।

এটা নতুন কিছু নয়। হল দখল ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের পরিচয় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অনেক দিন থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পরিস্থিতি চালু আছে। দেশের অপরাপর ক্যাম্পাসেও এ ধরনের ব্যাপার ঘটে, তবে সে সব জায়গায় এটা এমন স্পষ্ট রূপ নেয়নি বা নিয়ে থাকলেও সেটা এমন গুরুত্ব পায় না। এবারের পরিস্থিতির মধ্যে লক্ষণীয় দিক হলো পুলিশের ভূমিকা। পুলিশ পর পর কয়েকবার হলগুলোতে হানা দিয়েছে। তল্লাশি চালিয়েছে, পায়নি কিছুই। কিছু ধরপাকড় করেছে। অভিযোগ হয়েছে যে পুলিশ সহযোগিতা করছে এতদিনের অবহেলা-অপমানের শিকার ছাত্রলীগ সমর্থক ছাত্রদের অর্থাৎ সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের ভূমিকাও অনুরূপভাবে বদলে গেছে। এ অভিযোগের জবাবে তেমন কোনো প্রতিবাদ শুনেছি বলে মনে হয় না। এবং বলতেই হবে পুলিশের বিকারিত আচরণ যদি বদলে গিয়ে না থাকে, তাহলে আওয়ামী লীগ সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা সে পরিমাণেই ক্ষুণ্ন হবে। কারণ আওয়ামী লীগ সরকারের বিঘোষিত নীতি নিরপেক্ষতার। আইনকে নিজের পথে চলতে দেবার। যদি-এতো কিছু বলার পরও আওয়ামী শাসনে পুলিশের আচরণে কোনো ব্যত্যয় না ঘটে থাকে তা হলে সে নীতির পরাজয় সূচিত হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। এর ফলে দেশের বৃহত্তর আওয়ামী শুভানুধ্যায়ী মহলে নৈরাশ্য নেমে আসবে।

বেশ কিছু দিন থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি রুগ্ন প্রতিষ্ঠান। ব্যতিক্রম দু'একটা বাদে সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয় রুগ্ন, যদিও রুগ্নতার প্রকৃতি হুবহু এক নয়। দেশের অনেক কিছুই রুগ্ন- শিল্প রুগ্ন, রেলওয়ে রুগ্ন, ডাক-তার-টেলিফোন রুগ্ন, সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থা রুগ্ন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রুগ্নতা বহুমাত্রিক, তার মধ্যে একটা মাত্রা যুক্ত হয়েছে তার আবাসিক চরিত্রের কারণে। বিশের-ত্রিশের দশকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিলো আকারে ক্ষুদ্র, আজকের মাপকাঠিতে। তার সীমিত পরিসরে সেদিনকার বাংলাদেশে সে তার আবাসিক চরিত্র নিয়েই বিশিষ্ট হয়েছিলো। হলগুলো ছিলো তার আবাসিক কাঠামোর মৌল উপাদান। এ নিয়ে পুরো বিশের দশক ও ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকে চ্যান্সেলর ভাইস-চ্যান্সেলর সবাই সন্তুষ্ট ও গর্বিত। ওই সময়ের সমাবর্তন বক্তৃতায় এর প্রমাণ মেলে।

একটা কথা আছে সংখ্যাগত পরিবর্তন এক সময়ে গুণগত পরিবর্তনে পরিণত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাই হয়েছে। আজকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাম যদিও এক, তবু একে কোনোক্রমেই আদি বিশ্ববিদ্যালয় বলে পরিচয় দেয়া যায় না। যে দিন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে সেদিন থেকেই বলা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক চরিত্র বদলে গেছে।

পরিস্থিতি যে এমন হতে পারে, ষাটের দশকের শেষ দিকেই সেটা আঁচ করা সম্ভব ছিলো। তবে আমরা আরোও একটু পিছিয়ে যাবো। ফিরে যাবো '৪৭ পরবর্তী বছরগুলোতে, যখন আকস্মাৎ স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগের পরে পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত হলো সমগ্র পূর্ব-বাংলা প্রদেশের কলেজগুলোকে অধিভুক্তির দায়িত্ব।

সে দিন কেউ একথা ভেবে দেখেন নি যে এই সিদ্ধান্ত দেখা দেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্যু-পরোয়ানা হিসেবে। একটি গভীর ও সূক্ষ্ম পর্যালোচনার ভেতর দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা তৈরি হয়েছিলো ঃ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ (unitary)। সীমিত সংখ্যক ছাত্রের উচ্চশিক্ষার নিমিত্তে গড়া একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। অনাবাসিক যারা, তারাও নিজ নিজ হলের সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা থাকবে। ব্যবস্থাটি সফল করার জন্যে সে দিনের সকল শিক্ষক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। সম্পূর্ণ অর্থেই সেদিনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি প্রতিষ্ঠান (institution) ছিলো। আজকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে (রাজশাহী-চট্টগ্রামকেও) আর প্রতিষ্ঠান বলা যায় না।

প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা হলো, সংশ্লিষ্ট সকলেই তার লক্ষ্য চরিত্র ও সুনাম সম্বন্ধে সচেতন থাকবে ও আচরণে তার প্রমাণ রাখবে। বুকে হাত দিয়ে কেউ বলতে পারবে না এই নিরেখে ঢাকা (বা রাজশাহী-চট্টগ্রাম) বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতিষ্ঠান বলা যায়।

ক্যাম্পাস ধারণাকে আমি এক কথায় বাতিল করতে চাই না। শিক্ষাঙ্গনে একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে ক্যাম্পাসের বিকল্প নেই। তা সে ছোট হোক, বড়ো হোক। কিন্তু এর সঙ্গে আবাসিকতার ধারণা যুক্ত হলেই এই সমস্যা দেখা দেবে। যা দেখা দিয়েছে আমাদের বড় ক্যাম্পাসগুলোতে। ক্যাম্পাসে অধিকাংশ ছাত্রের আবাসিক ব্যবস্থা করার মতো সঙ্গতি থাকলে কথা ছিলো না। কিন্তু আমাদের সরকার বা সমাজ সে ব্যবস্থা করতে পারছে না বলেই এতো হাঙ্গামা।

যদি কেউ আপত্তি করে বলেন, বিদেশের অনেক নামী বিশ্ববিদ্যালয়, যে গুলো কয়েক শতাব্দি ধরে টিকে আছে ও একই সঙ্গে বৃহদত্ব অর্জন করেছে। অথচ যাদের সুনামের হানি ঘটেনি, তাদের ক্ষেত্রে কি বলা যাবে? সংখ্যাগত পরিবর্তন যদি গুণগত পরিবর্তনের সমার্থক হয় তা হলে কি বলা যাবে অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, হার্বার্ড, প্রিন্সটন, ইয়েল এই সব মুষ্টিমেয় নামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আর পূর্ব পরিচয়ে চেনা সম্ভব নয়।

এর উত্তর হলো এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বৃদ্ধি হয়েছে সর্বাঙ্গীন। আবাসিক চরিত্র তারা ক্ষুণ্ন হতে দেয়নি। সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তারা সবদিকেই বর্ধিত হয়েছে। সেখানে প্রশাসন বরাবর কর্তৃপক্ষের দৃঢ়মুষ্টির মধ্যেই রয়েছে, ছাত্র-নামধারী কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবকের হাতে ব্রয়ে যায় নি।

ঢাকা (ও অন্য দু'টি বৃহদাকার) বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা হলো- পত্তন থেকেই তারা ক্যাম্পাস বিশ্ববিদ্যালয়। ক্যাম্পাস ধারণাটি এদেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির বিবেচনায়, একটি কৃত্রিম ও অবাস্তব ধারণা। যে সব প্রতিষ্ঠানের লোকবল কঠিনভাবে সীমাবদ্ধ- ক্যাডেট কলেজ, পিএটিসি, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজ ইত্যাদি সেখানে ক্যাম্পাস ধারণা কার্যকর। একটি নির্দিষ্ট সীমার বাইরে গেলেই ধারণাটি ভেঙে পড়ে।

এখানে একটি কথা যোগ করা প্রয়োজন। ক্যাম্পাস ধারণাকে আমি এক কথায় বাতিল করতে চাই না। শিক্ষাঙ্গনে একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে ক্যাম্পাসের বিকল্প নেই। তা সে ছোট হোক, বড়ো হোক। কিন্তু এর সঙ্গে আবাসিকতার ধারণা যুক্ত হলেই এই সমস্যা দেখা দেবে। যা দেখা দিয়েছে আমাদের বড় ক্যাম্পাসগুলোতে। ক্যাম্পাসে অধিকাংশ ছাত্রের আবাসিক ব্যবস্থা করার মতো সঙ্গতি থাকলে কথা ছিলো না। কিন্তু আমাদের সরকার বা সমাজ সে ব্যবস্থা করতে পারছে না বলেই এতো হাঙ্গামা।

ব্যবস্থার পর্যাপ্ততা নিশ্চিত না করে কোনো প্রতিষ্ঠান গঠন করা যে আহাম্মকি-এই সরল সত্যটা আমরা বুঝতে চাইনি। দশজন যাত্রী বহনক্ষম নৌকায় বিশজন চড়ে বসলে সে নৌকা যে ডুবতে পারে, সেটা বুঝতে চায়নি সরকার; বুঝতে চায়নি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, কোনোদিন বলতে শুনিনি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে, আমাদের বর্তমান ক্ষমতায় আমরা এতো জনের বেশি ছাত্র ভর্তি করবো না। করলে তাদের প্রতি আমরা সুবিচার করতে পারবো না; সেটা আমাদের পেশাগত অসততার কাজ হবে।

যে দুই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নীতি চালু আছে, সেখানে সমস্যা এ রূপ নেয়নি, তবে ছাত্র রাজনীতির যে সংস্কৃতি দিনে দিনে গড়ে উঠেছে, যা দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক সংস্কৃতির সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে, তার অশুভ প্রভাব এসব জায়গাতেও পড়ে থাকে মাঝে মধ্যে।

এখন প্রয়োজন ঢাকা মহানগরীর জন্যে একটি উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করা এবং উচ্চ শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণ। কলকাতা, দিল্লী, লন্ডনে এর মডেল পাওয়া যাবে। ঢাকা মহানগরীতে একাধিক কলেজের পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর আজকের অসহনীয় চাপ ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্যায়ের আকার অর্ধেকে নামিয়ে আনতে হবে। স্নাতকোত্তর কোর্স দু'বছর মেয়াদী করে, তার আকার বর্তমানের এক দশমাংশে নামিয়ে আনলে দেশের লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। তবে এই সংস্কারের পথে ঘড় বাধা আসবে বাইরে থেকে ও ভেতর থেকে। বাইরের বাধা হবে স্লোগানধর্মী, আর ভেতরের বাধা হবে শিক্ষকদের কায়েমী স্বার্থের দিক থেকে। কায়েমী স্বার্থ বলতে আমি কি বোঝাতে চাই। সেটা আর এক প্রসঙ্গ। আজ এপর্যন্তই।

৩১.০৮.৯৬

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ঃ প্রাবন্ধিক, কলাম লেখক, বুদ্ধিজীবী, প্রাক্তন উপাচার্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়